জিহাদের পথের

নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

জিহাদের পথের নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده– اما بعد:

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿11﴾

قال رسول الله صل الله عليه و سلم : ان الله يحب كل قلب حزين

و قال رسول الله صل الله عليه و سلم : لن يبرح هذا الدين قائمًا حتى تقوم الساعة يقاتل عليه عصابة من المسلمين —-

او كما قال عليه الصلوة و السلام–

অবতারণাঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালার লক্ষ কোটি অনুগ্রহ এবং একমাত্র তারই অনুকম্পা যে, এ ফেতনার যুগে আমাদেরকে দুনিয়াবী সকল প্রকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত করেছেন। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখেরাতের প্রশস্থতার দিকে অগ্রসর হবার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে আখেরাত অর্জনের দিকে উৎসাহী বানিয়েছেন। এসবই আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সচেষ্ট থাকা। কেননা, আমরা এসকল অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিলাম না।

আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য, আল্লাহ্ তা'য়ালার ভালোবাসার জন্য, আল্লাহ্ তা'য়ালার দ্বীনের জন্য - আমাদের ভালোবাসাকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে, প্রিয় ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার দ্বীনের দিকে এসেছি। বাস্তবে এটা অনেক বড় ও কঠিন একটা পদক্ষেপ। এর জন্য না আমাদের কোন যোগ্যতা ছিলো, আর না আমাদের কোন হিম্মত বা সাহস ছিলো - যার দ্বারা এ কঠিন বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম! বরং আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালাই দুনিয়ার এ ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আখেরাতের দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দিয়েছেন।

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে দুনিয়া তার সকল প্রকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছে। মানুষদেরকে তার ফাঁদে ফেলতে সব কৌশল অবলম্বন করছে। কিন্তু মোবারকবাদ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার সকল জিনিসের ধোঁকা থেকে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে আখেরাতের মোকাবেলায় কুরবানী করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার স্বাদকে বিসর্জন দিয়ে আখেরাতের স্বাদ গ্রহণ করার মানসে এই বিসর্জন দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ ধরনের পবিত্র আত্মার (জীবনের) মাধ্যমেই এ দ্বীনকে হেফাজতের ব্যবস্থা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ দাওয়াত নিয়ে আসেন এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সে দাওয়াতকে গ্রহণ করতে যেভাবে সম্মানিত পুরুষেরা লাব্বাইক বলে ছুটে এসেছিল। সেসময় সম্মানিতা মহিলাগণ একটুও পিছনে ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ দ্বীনের ঝান্ডাকে উচুঁ করার জন্য যেখানেই পুরুষের খুনকে গ্রহণ করেছেন, কুরবানীকে কবুল করেছেন বা হিজরতের তাওফীক দান করেছেন, সেখানে মহিলাদেরকেও হিজরত থেকে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর সুযোগ দান করেছেন।

মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এভাবে এসেছে-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সুরা তাওবা ৯:৩৩]

এবং অন্যত্র ব্যাপকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সুরা যারিয়া'ত ৫১:৫৬]

অর্থাৎ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল তার আল্লাহ্ - তা'য়ালার জমিনের উপর সকল ভ্রান্ত ধর্মকে নির্মূল করে দিয়ে আল্লাহর বিধানকে সবার উপরে তুলে ধরবে। আল্লাহর দেওয়া বিধানকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার অবধারিত ফয়সালাকে কায়েম করবে - যাতে করে মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জিন্দেগী আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধানমতো হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে যেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সেখানেই মহিলাদের উপরেও জিম্মাদারীর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষের কুরবানীঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে জিম্মাদারী অর্থাৎ জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান, কুরআনী অনুশাসন বা সুন্নতী ত্বরিকা মোতাবেক বানানোর দায়িত্বকে যেভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন, তেমনিভাবে মহিলাদের উপরেও উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কেননা এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা যেমনিভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন, তেমনিভাবে মহিলাগণও বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থাৎ তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]।

যেখানেই অনেক জিম্মাদারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপরে ন্যস্ত করেছেন, সেখানেই মহিলাদের উপরেও অনেক জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন। সাহাবীদের সাথে সাথে সাহাবিয়া (রা.) প্রমূখেরাও দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষদের থেকে একটুও পিছিয়ে ছিলেন না। ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন অনেক ঘটনা নজরে পড়বে যে, যখনই জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য, আখেরাতে অগ্রসর হওয়ার জন্য পুরুষেরা দৌড়ে দৌড়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন, সেখানে মহিলাগণকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন হিম্মত এবং সাহস যুগিয়েছেন যাতে করে তারাও পুরুষদের থেকে পিছনে পড়েন নি। এটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বড় মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ ছিলো। আল্লাহ্ যাকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন, সেটা তার জন্য বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা.) দের কুরবানীঃ

আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা!

মহিলা সাহাবীগণ এ দ্বীনের জন্য অগণিত কুরবানী করেছেন। তাদের স্বামীকে কুরবানী করেছেন, কুরবানী করেছেন তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে। নিজ ভাইদেরকে নিজ হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়েছেন। এতটা কুরবানী করা সত্বেও কোন একজন সাহাবিয়া কখনো তাদের এই কুরবানীর জন্য আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেন না। অথচ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত জান্নাতের ফয়সালা ও স্বীয় সন্তুষ্টির বানী শুনিয়ে দিয়েছেলেন। একারণে তারা কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলেন? না-কি তারা আত্মভোলা হয়ে ছিলেন? না-কি দুনিয়ার কোন ফেতনা থেকে উদাসীন ছিলেন?

এমনটি কখনো হয়নি। বরং তারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতের জন্য স্বীয় মাতৃভূমি পবিত্র মক্কাকে ছেড়েছেন, স্বীয় আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। কখনোবা মেয়ে তার বাবা থেকে আলাদা হয়েছে, মায়েরা তার প্রিয় সন্তানকে পৃথক করেছেন। এভাবে দ্বীনের জন্য সব ধরনের কুরবানী করেছেন আকুণ্ঠভাবে। কিন্তু কখনো তারা একটি মুহূর্তের জন্যও দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়াবী কোন ফেতনায় জড়িয়ে যাননি। কখনো তারা স্বীয় নফসের ধোঁকা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। কখনো এমনটি হয়নি যে, স্বীয় আত্মার উপর নিশ্চিতভাবে বসে ছিলেন এ কথা ভেবে যে, আমরাতো হিজরতের মতো অনেক বড় এক কুরবানী করেছি, অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্ এর মতো আমলের আঞ্জাম দিয়েছি এবং জিহাদের ময়দানে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি! তাই এখন আমরা একটু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে উপার্জন করে নেই বা বসবাসের জন্য একটি ঘর বানিয়ে নেই, অথবা ঘরের সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় করে নেই। ইতিহাসে এমন কোন স্বাক্ষ্য পাওয়া যাবে না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা: এর অবস্থা:

এমনকি উম্মুল মু'মিনীন, রাসুলুল্লাহ্র পবিত্রতমা স্ত্রী (রা.) দের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তাদের আমলে কোন পরিবর্তন আসেনি। অন্যান্য সাহাবা ও সাহাবীদের আমলের মধ্যেও কোন পরিবর্তন আসে নি। যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জবানে অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে হযরতে আয়েশা রা. প্রায় ৩২ বছর জীবিত ছিলেন। কিভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন?

আম্মাজান আয়েশা ঘরের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পদ জমা করে রাখেননি। এ দুনিয়ার ভালোবাসা ও মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেননি। একটি মূহুর্তের জন্যও এ কথা চিন্তা করেননি যে, জীবনে তো অনেক ত্যাগ স্বীকার বা কুরবানী দিয়েছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সর্বদা সবখানে ছিলাম, এ দ্বীনের জন্য সর্বপ্রকারের কুরবানী করেছি, অনেক গাযওয়াহ বা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছি, এমনকি হিজরতের সময়ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে শরীক ছিলাম। তাই এখন একটু আরাম করে নেই। এমন চিন্তা কখনো অন্তরে স্থান দেন নি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় গিয়েছেন, যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আম্মাজান আয়শার প্রতি রাজী বা খুশি ছিলেন। তথাপি দুনিয়ার একটু স্বাদ আস্বাদন করে নেওয়া বা গ্রহণের কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা: এর তালি/পট্টি যুক্ত কাপড় পরিধান করা:

একবার এক তাবেয়ী (যিনি হযরত আয়েশা রা. এর দুধ ভাই ছিলেন) আয়েশা রা. এর ঘরে আসেন। তখন তিনি নিজের কাপড়ে তালি বা পট্টি লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করেলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা অনেক প্রশস্থতা দান করেছেন, তাই আপনি তো নতুন কাপড় পরিধান করতে পারেন? তখন আয়েশা রা. জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করেনা, তার জন্য নতুন কাপড় পরিধান করার কোন অধিকার নেই।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা: এর বদান্যতা:

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর নিকট আশি হাজার দিরহাম হাদিয়া আসলে তিনি তার খাদেমাকে ঐ দিরহাম বন্টনের নির্দেশ দিলেন। খাদেমা সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্টন করতে করতে সম্পূর্ণ দিরহাম শেষ করে দিলেন। এমনকি একটি দিরহামও অবশিষ্ট রাখলেন না। সেইদিন আয়েশা রা. রোযা রেখেছিলেন তাই ইফতারের সময় খাদেমাকে বললেন যে, ইফতারের জন্য ঘরে কিছু আছে?

তখন খাদেমা বলতে লাগলেন আপনি তো ইফতারের জন্য দু'টি দিরহাম রেখে দিতে পারতেন! যার দ্বারা গোস্ত/রুটি ইত্যাদি ক্রয় করতে পারতাম। এ কথা শুনে আয়েশা রা. বলতে লাগলেন যা হওয়ার তা-তো হয়েই গেছে। এখন ঘরে যা আছে তা নিয়ে এসো। অথচ, চাইলেই তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে ভালো খাবার খেয়ে নিতে পারতেন, ভালো ভালো দামী পোষাক পরিধান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এমনটি করেননি।

হযরত আবু দারদা রা. এর ঘটনা-

হযরত আবু দারদা রা. এর দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিনি অনেক গরীবি অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একবার কোথাও থেকে কিছু টাকা পয়সা হাদিয়া আসে। তখন উম্মে দারদা রা. বললেন যে, আমার অমুক জিনিসটির অনেক প্রয়োজন তাই সেটির ব্যবস্থা করে দিন। আবু দারদা রা. বললেন যে, এ টাকা পয়সাকে আমি জমা করে রাখবো। উম্মে দারদা রা. বললেন যে, আমাদের কাছে সঞ্চয় করার কোন জায়গা বা ব্যাংক আছে? আবু দারদা রা. বললেন, হ্যা! আমাদের কাছে আখেরাতের ব্যাংক আছে সেখানে আমি এটাকে জমা করে দিচ্ছি। একটা প্রয়োজন ছিলো এবং অত্যন্ত গরিবী অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন তারপরেও এ কথা শুনে উম্মে দারদা রা. বললেন যে, ঠিক আছে! আখেরাতের ব্যাংকে জমা করে দিন।

সাহাবী ও সাহাবিয়্যাদের দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবিয়াদের আমল, যদিও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে বলেছেন

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। [সুরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে গেলে ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

উক্ত আয়াতে কারিমা শুনে তারা কখনো নফস থেকে বেখবর বা গাফেল হননি। কখনো এ ধারণা করেননি যে, আমরাতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি, এখন দুনিয়া আমাদের উপর কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা, আমাদের নফস এখন বাঁকা পথে চলতে পারবেনা! তারা জানতেন যে, নফস এমন এক বস্তু - যে ব্যক্তি এর থেকে ক্ষণিকের জন্যও বেখবর বা গাফেল হয়ে যায় সে তাকে ধোঁকা দিয়ে ছাড়ে এবং তার উপর বিজয়ী হয়ে ওঠে।

এ জন্য আমার মা ও বোনেরা!

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় অনুগ্রহ ও অশেষ দয়া হলো - বর্তমানের ফেতনার যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার তাওফিক দান করেন। যারফলে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেয়, নিজের অবস্থানকে ছেড়ে দেয়। আপন পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের উপর পাহাড়ের মতো অবস্থান করাটা অনেক বড় কুরবানী, অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার জন্য অগনিত নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আর যদি ঐ সকল নিয়ামতের জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়ে যায় এবং সেগুলো দেখে নেই, তাহলে আমরা সেগুলো হাসিল করার জন্য পাগল হয়ে যাবো। এবং আকাংখা করতে থাকবো যে, হায়! যদি পুরা দুনিয়া শতবার আমার হতো আর প্রত্যেকবারই সবকিছু কুরবানী করে দিয়ে এ সকল নিয়ামত পেয়ে যেতাম! এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পথে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে, এক একটা কষ্টের বদলায়, প্রতিটি চিন্তা-ফিকিরের বিনিময়ে, এমনকি ঐ দুঃখ ও পেরেশানী যা দ্বীনের জন্য আমাদের চেহারায় ফুটে ওঠে, আপনার কপালে চিন্তার রেখা ভেসে ওঠে - এ

সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন এমন এমন নিয়ামত দান করবেন যা দেখে অন্তর খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে।

নফস ও শয়তানঃ আমাদের দুই শত্রুঃ

কিন্তু এতকিছুর পরেও আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের জান্নাতের পথে বাকা হয়ে বসে পথ আটকে আছে। এ দুনিয়া তাদের থেকে পালাতে থাকে - যে তাকে পেতে চায়। আর দুনিয়া নিজের দিকে তাকেই টেনে নেয়, যারা দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় বা দুনিয়াকে লাথি মারে। তাইতো সম্ভাবনা আছে যে, যদি একটা মূহুর্তের জন্য আমরা অসর্তক থাকি তাহলে দুনিয়া আমাদের কাছে চলে আসবে এবং এ দুনিয়া তার চক্রাতের ফাঁদে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিবে। এ জন্য সর্বদা আমাদেরকে নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকা, সদা জাগ্রত থাকা, দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুনিয়া ত্যাগঃ

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা.) এর জিন্দেগী আমাদের সামনে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - যার ব্যাপারে কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে যে, ‘আপনার অগ্র ও পশ্চাতের গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়েছে’, তারপরেও তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেছেন? এ দুনিয়ার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল?

সাহাবী ও সাহাবীয়াগণ (রা.) একথা মনে করেননি যে, এ দুনিয়া আমাদের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করবেনা! আমরা হিজরত করেছি, আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছি, ভালো ভালো খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি! সুতরাং দুনিয়া কিভাবে আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো নিষ্পাপ ছিলেন, তাকে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কেমন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন? হাদিসে এসেছে-

كان رسول الله ﷺ متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة

(ج:1 ص:282 خاتم النبيّين ﷺ)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা (দ্বীন ও উম্মতের জন্য) পেরেশান ও চিন্তিত থাকতেন, তাঁর কোন বিশ্রাম ছিলনা। (খাতামুন নাবিয়্যিন:খণ্ড-১ পৃঃ২৮২)

অর্থাৎ সর্বদা তিনি পেরেশানীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন, চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতেন, চেহারার মধ্যে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এমন কোন মূহুর্ত অতিবাহিত হয়নি যখন নিশ্চিত মনে সময় পার করতেন। সর্বদা চিন্তা করতেন, কপালে পেরেশানীর চিহ্ন লেগেই থাকতো। সর্বদা দারিদ্রতার মধ্যে কাটাতেন, কখনো শান্তভাবে থাকতেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রুমাল কেমন ছিলো? তার বিছানা কেমন ছিলো? তাঁর কাপড় কেমন ছিলো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিধেয় বস্ত্র কেমন ছিলো?

এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে পরিধান করার মতো কিছুই ছিলো না। সায়্যিদুনা হযরত বিলাল (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুজরার বাইরে দাড়িয়ে আছেন, এবং অপেক্ষা করছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের জন্য বাহিরে আসবেন। তখন সালাতে আসার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে একটি জামাও ছিলো না। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুনিয়ার কি প্রভাব পড়তে পারতো?

একবার সায়্যিদুনা উমার (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর বিছানা ও শরীর মোবারকে বিছানার দাগ দেখে কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন। 'হে উমার! কেন কাঁদছো'? হযরত উমার রা. বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটা কেমন যে, কিসরা (পারস্য/ইরান) ও কায়সার (রোম বা ইটালি) এর সম্রাটগণ আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য আরামের সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। অথচ আপনি আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্ধু, আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের অনুগত বান্দা'! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "উমার! তুমি কি চাও যে, আমরা দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রতিদান গ্রহণ করি"?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ এমন শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামগণকে দুনিয়ার হাক্বিকত ও বাস্তবতা এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং পবিত্র স্ত্রীদেরও এমন শিক্ষা দিয়েছেন। সকল সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে কিভাবে/কি অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে।

সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রা.) দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ভীত ছিলেনঃ

সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন, তখন কেউ মধু মিশ্রিত পানি দিলেন। যখন মধু হাতে নিলেন তখন এটতাই ক্রন্দন করছিলেন যে, তার কান্না শুনে বাসার সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কান্না বন্ধ করলেন এবং পুনরায় আবার কাঁদতে লাগলেন। এক সাহাবী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন কাঁদছেন"?

তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলতে লাগলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অবস্থান করছিলাম। তখন দেখলাম তিনি হাত দিয়ে কি যেন দূরে ঠেলে দিচ্ছেন এবং বলছেন, "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা"। অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন"? তিনি বললেন যে, "আমার নিকট দুনিয়া এসেছিল আর আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। তারপরে দুনিয়া বলতে লাগলো যে, আপনি তো বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরের লোকেরা কিভাবে বাঁচবে? তাই আমি আবু বকর ভয় পাচ্ছি যে, না-জানি আমি সেই দুনিয়ার ফাঁদে আটকে যাচ্ছি!

সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে আমির (রা.) এর দুনিয়ার বিমুখতাঃ

সায়্যিদুনা উমার (রা.) এর হাতে একবার এক ব্যক্তি মধুর শরবত দিলে তিনি তা ঘুরাতে ফিরাতে থাকেন। এরপর সেই শরবত পান না করেই ফেরত দিয়ে দেন। এরা তো ঐ সকল মহাপুরুষ যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের খোশ-খবর দিয়েছেন!

একবার উমার রা. এর খিলাফতের সময় তার কাছে হিমস্ (সিরিয়ার একটি শহর) থেকে একটা দল গরিবদের তালিকাসহ আসলো। উমার (রা.) দেখলেন সেই তালিকায় তাদের গভর্নর সাঈদ বিন আমিরের নামও রয়েছে। তাই উমার (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, গরিবদের এই তালিকায় তোমাদের গভর্নরের নাম কেন? তিনি তোমাদের আমির! তারা বললেন যে, "আমাদের আমির আমাদের গরিবদের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তিনিও গরীব"। হযরত উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে বাইতুল মাল থেকে যে, ওযিফা বা সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় তা দিয়ে তিনি কি করেন"? তারা বললেন, "তার কাছেই কিছুই রাখেন না বরং অন্যদেরকে দিয়ে দেন"।

ঐ দলটি যখন ফিরে যায়, তাদের কাছে উমার (রা.) সাঈদ বিন আমিরের জন্য কিছু দিরহাম দিয়ে দেন। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে ঐ দিরহাম সাঈদ বিন আমিরের হাতে গেলে তিনি এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, আমি (স্ত্রী) তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আমীরুল মু'মিনীন কিছু হয়েছে না-কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "অনেক বড় এক মুসিবত এসেছে"।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি? তিনি বলনেন, "না, এর থেকেও বড় বিপদ এসেছে"। আমি বললাম, "তাহলে কি হয়েছে"? তিনি বললেন, " الدنيا اتتنى الفتنة اتتنى দুনিয়া এসেছে, আরে ফিতনা এসেছে। তোমার কাছে যদি কিছু থাকে নিয়ে আস! আমি এ ফিতনাকে দ্রুত দূর করতে চাই"। এ কথা শুনে স্ত্রী একটি থলে নিয়ে আসলে সেই দিরহামকে থলেতে করে মানুষদের মাঝে বন্টন করতে লাগলেন।

দুনিয়ার হাক্বিকতঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যাকে এ দুনিয়ার হাক্বিকত সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে আখেরাতের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা যেই অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহর সাক্ষাতের তামান্না যেই অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে কোন অবস্থাতেই এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে কখনো স্বীয় নফস থেকে গাফেল হতে পারে না। কখনো সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে অসতর্ক থাকতে পারে না। সর্বদাই সে পেরেশান এবং চিন্তায় মগ্ন থাকে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে থাকতেন। এ চিন্তা ও পেরেশানীতে থাকাটা দুনিয়া অর্জনের জন্য নয় বরং দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

মুজাহিদের অর্ধেক নেকিঃ আখেরাতের ফিকির-

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবীয়া ছিল, যখনই তার স্বামী ঘরে আসতেন তখন বলে দিতেন যে, স্বাগতম আমার সর্দারকে, স্বাগতম ঘরের লোকদের নেতাকে। তারপর তিনি এই কথাটি বলতেন –

أن كان همك لاخرتك فزادك الله هما وإن كان همك لا خرتك فإن الله سيرزقك ويحسن إليك

অর্থাৎ যদি তোমাদের চিন্তা-পেরেশানী আখেরাতের জন্য হয়ে থাকে, তো আল্লাহ্ যেন তোমাদের চিন্তা ফিকির ও তার সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দেন, আর যদি দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন সে পেরেশানীকে সহজ/কমিয়ে করে দেন এবং উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন।

ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে উক্ত ঘটনার বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি ঘরে আসি তখনই আমার স্ত্রী এ কথা বলতে থাকে। এ ঘটনা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমার স্ত্রীর জন্য মুজাহিদের অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। সে আল্লাহর রাস্তায় আমলকারীদের একজন বা আল্লাহর মজদূরদের একজন হিসেবে গন্য হবে। (ইবনে আবীদ্দুনিয়া-৯৪ পৃ.)

আখেরাতে ফিকির এমনই এক আমল। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা-ভাবনা এমনই এক আমল - যে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সে কখনো দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। এ দুনিয়ার স্বাদ তার কাছে কোন স্বাদ-ই মনে হয় না বরং তিক্ত মনে হয়। দুনিয়া যতই সুন্দর অবয়ব নিয়ে তার সামনে আসুক না কেন, সে দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে না। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত সূরা আনকাবূতে বলেন-

مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لأَتٍۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষন করে,

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের একটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আর সেটা হলো মওত।

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لأَتٍۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫]

সুতরাং তার জন্য উচিত হলো যে, সে যেন উক্ত বাধাকে দূর করে, উক্ত বাধাকে উপেক্ষা করে অথবা উহা দূর হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫]

আর আল্লাহর সে নির্ধারিত সময় বা ক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। যার জান্নাতের স্বাদ অনুভূত হয়েছে, যার সামনে কুরআনে কারীমের নকশা খোলা রয়েছে, যে জান্নাতের ব্যাপারে কুরআনে কারীম বিস্তর আলোচনা করেছে সে ব্যক্তি এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে দুনিয়াকে ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, তার কাছে দুনিয়া পছন্দ হোক বা না হোক, তার কাছে প্রশস্থতা থাকুক বা না থাকুক সে কখনো দুনিয়ার ফিতনায় পড়তে পারে না।

দুনিয়ার গোলামঃ

আর যার লক্ষ্য আখেরাত থেকে সরে যাবে, তার মধ্যে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা থাকবে না, শাহাদাতের আকাঙ্খাও থাকবে না। হয়তোবা তার কাছে দুনিয়ার কিছুই নেই তবুও পুরা দুনিয়ার সব কিছুর ভালোবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। হতে পারে তার কাছে কিছুই নেই, আশ্রয়ের মতো কোন বাসস্থানও নেই, পায়ের জুতাও নেই, তবুও এটা সম্ভব যে তার দিল দুনিয়ার ভালোবাসায় ডুবে আছে।

আখেরাতের মেহমান!

আর যদি কেউ আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হয়, দুনিয়ার হাক্বিকত যদি তার সামনে থাকে, আখেরাতের স্বাদ যদি তার সামনে থাকে, দুনিয়া বিমূখতা যদি তার সামনে থাকে - তাহলে তার সামনে যাই কিছু আসুক না কেন; যতই ধন-সম্পদ অর্জিত হোক না কেন; যতই দামি দামি বস্তু তার হোক না কেন, সে কখনো ঐগুলিকে অন্তরে স্থান দেয় না। সে কখনো এমন ভাবে না যে, এটা আমার নিকট খুব পছন্দের বা খুব শখের। তাই তার দিলে ঐ জিনিসের মহব্বত থাকে না।

আখেরাতের চিন্তাঃ দুনিয়ার ফিকির

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের প্রতি হাজার কোটি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে খালি করে আখেরাতের ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর অসীম দয়া ও কৃপা যে, আমাদের দিল থেকে দুনিয়া অর্জনের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করে আখেরাতের চিন্তা ও ফিকিরকে ভরে দিয়েছেন। আর এটা ছোট কোন নিয়ামত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

إن الله يحب كل قلب حزين

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক চিন্তাশীল অন্তরকে ভালোবাসেন [মুসতাদরিক]

অর্থাৎ যে দিলের মধ্যে দ্বীনের জন্য চিন্তা থাকে সে দিলকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। যে দিল দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বদা অস্থির থাকে সে আল্লাহর নিকট অতিপ্রিয়। অন্যত্র হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেন-

اناعند الكسرة قلوبهم من اجلى

আমি ঐ অন্তরে থাকি, আমি ঐ দিলকে মহব্বত করি যে দিল আমার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যে অন্তর আমার জন্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, সে দিলের মাঝে আমি অবস্থান করি।

মালিক ইবনে দিনার রহ. বলেন, এ অন্তরের দৃষ্টান্ত হলো ঘরের মতো। যদি এ দিল চিন্তা থেকে খালি হয় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়, দ্বীনের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, তবে সে দিল বিরান ঘরের ন্যায়। আসলে এটা ঘর হলেও লোকজন বসবাস না করায় তাকে বিরান ঘর বা অনাবাদী ঘর বলা হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদের অন্তরে আরো বেশি পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দেন। আমাদের দিলের মধ্যে দ্বীনের পেরেশানী যেন অ-নে-ক বেশি পয়দা করে দেন।

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত শায়িত সাপের ন্যায়!

আমার মা ও বোনেরা!

আমরা যেন কখনো নফস থেকে বেখবর বা অসতর্ক না থাকি। সর্বদা নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকা খুব-ই জরুরী। নফস কোন সূরতে যেন আমাদের উপর আক্রমণ করে না বসে। এক বুযুর্গ বলেন- "নফস এর চরিত্র এমন – কেমন যেন মনে হয় যে নফস শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা শেষ হয় না"। আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো – "শুয়ে থাকা সাপের মতো, যাকে দেখে মনে হয় সে মারা গেছে। কিন্তু যখনই ঐ সাপ থেকে অসতর্ক হয়, যখনই সে সুযোগ পায়, তখনই সে দংশন করে ফেলে। নফস এর অবস্থাও এমন-ই"।

দুনিয়ার ভালোবাসাঃ আখেরাতের মহব্বত

আল্লাহর দরবারে শত সহস্র শুকরিয়া যে, তিনি অগণিত নেয়ামত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তবুও আমরা যেন কখনো এটা মনে না করি যে - আমাদের উপর নফস বা আত্মা আক্রমণ করবে না, হামলা করতে পারবে না বা পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত বা লোভ-লালসা আমাদের অন্তরে আসবে না। দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা অবশ্যই আসতে পারে। এমনকি দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার পরেও আবার তার মহব্বত অন্তরে আসতে পারে।

দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে আসার জন্য এটা জরুরী নয় যে, কোন দামী বা মূল্যবান বস্তুর জন্য আসতে হবে। বরং হতে পারে দুনিয়ার ভালোবাসা ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেও আসতে পারে। যখন দিল আখেরাতের অর্জন থেকে বিরত থেকে দুনিয়া অর্জনের জন্য লেগে যায়, আর আল্লাহর সাক্ষাত থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে চলে যায়, তখন মানুষটি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

হয়ত সে হিজরত করে থাকতে পারে অথবা জিহাদের জন্য বড় বড় ময়দান পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু যখনই আল্লাহর সাক্ষাত থেকে অন্যমনষ্ক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা অন্তর থেকে বের হয়ে যায় বা সাক্ষাত থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তাহলে সে দুনিয়াদার হয়ে যায়। সেও তখন ছোট ছোট জিনিসের জন্য লড়াই করে থাকে। অতি নগন্য জিনিসের মহব্বত তার অন্তরে স্থান করে নেয়। পদ-মর্যাদার লোভ, প্রসিদ্ধিতার ভালোবাসা, দুনিয়ার ভালোবাসা তার দিলে ঢুকে যায়। মানুষেরা তার প্রশংসা করুক – এই চাওয়া তার অন্তরে চলে আসে। আসবাবপত্র জমা করার মহব্বত, ভালো মনোরম পরিবেশে থাকার মহব্বত, স্থীরতার সাথে দুনিয়াতে থাকার মহব্বত অন্তরে জায়গা করে নেয়। যদি কেউ নফস থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তবে তার অবস্থা এমনটাই হয়।

কে ইবলিসকে শয়তান বানালো?

এজন্য কোন অবস্থাতেই নফস নামক এ দুশমন থেকে অসতর্ক থাকা যাবে না। এ নফস এমন দুশমন যে, শয়তানের থেকেও ভয়ঙ্কর বা বিপদজনক। এটা এমন এক শত্রু যে, শয়তানকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। সে শয়তানকে শয়তানে পরিণত করেছে।

মানুষ যখন নফসের কাছে পরাজিত হয়ে যায়, নফস এর গোলামী বা আনুগত্যতা করতে থাকে, তার সুবিধা মতো চলতে থাকে তখন সে মানুষটির আর কিছুই করার থাকে না। তারপর সে নিজেকে নিজে বড় মনে করতে থাকে। অতঃপর সে

নিঃকৃষ্ট মানুষদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তখন তার অনুভূতি শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, যার ফলে সে তার আখেরাতকে বরবাদ করে ফেলে।

সুতরাং এ নফস থেকে বেঁচে থাকা খুব-ই জরুরী। এ নফস তো এমন জিনিস যে, হিজরত করা সত্ত্বেও, জিহাদের বড় বড় ময়দানে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, অনেক কুরবানী করা সত্ত্বেও যে কারোর উপর আক্রমণ করে বসতে পারে।

নফসের ধোকাঃ টার্গেট অনুযায়ী

সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) যার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতেন, ভয়ে থাকতেন, কখনো উদাসীন হতেন না, সেটা হলো - নিজেকে নিজে বড় মনে করা। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, নফস সর্বদা মানুষের মেজাজ বা তবিয়ত অনুযায়ী গোমরাহ করতে থাকে। দুনিয়াদারদেরকে দুনিয়ার মাধ্যমে, দ্বীনদারকে দ্বীনি বিষয় দিয়ে গোমরাহ্ করে থাকে।

দ্বীনদারের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে সেটা মূলত দ্বীন-ই। আর সেটা হলো- আমিতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি, আমিতো হিজরত করেছি, আমার স্বামীতো অনেক বড় কুরবানী করেছে, সে-তো এই সেই আরো কত শত দ্বীনি কাজ করে! কত শত ময়দানে সময় দিয়েছে! এরপরে তার মধ্যে এমন খারাবী চলে আসে, যার কারণে সে অন্যের মধ্যে খারাবী দেখতে থাকে এবং সে ভুল ধরতে থাকে।

দ্বীনি দৃষ্টিকোন থেকে যখন নিজের বুলুন্দী চলে আসে, তখন সে অন্যকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে, অন্যকে ছোট থেকে ছোট মনে করতে থাকে। অন্যকে কোন দাম-ই দেয় না। এটাই হলো সেই মোক্ষম সময় যে সময় নফস তাকে ধ্বংস করতে তৈরী থাকে। এটাতো সেই সময় যে সময়ে নফস তাকে ধোঁকা দিতে তৈরি থাকে। এজন্য বুযুর্গ বলেন-

কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত আল্লাহর ওলী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সবচে বড় গোনাহগার বা অপরাধী মনে না করে। নিজের আমলের ব্যাপারে ভয় করতে থাকে যে, এ আমল কবুল হবে কি হবে না।

আল্লাহর সামনে দাড়ানোর ভয়ঃ হযরত উমার রা.

উমর রা. এর অবস্থা দেখুন - যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ জান্নাতের খোশখবরী দিয়ে বলেছেন- উমার জান্নাতী। উমার (রা.) তখন যখম অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যখনই কোন সাহাবী তার নিকট আসেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, “উমরের কি অবস্থা হবে”? কান্না করছিলেন আর বলছিলেন, “উমারের কি হবে”?

সাহাবীগণ শান্তনা দিচ্ছিলেন যে, “আমীরুল মু’মিনীন! আপনার এ কুরবানী, আপনার এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনার সাথে উত্তম আচরণ করবেন”। তখন উমার (রা.) বলেন, “তোমরাতো আমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিচ্ছো। কেননা আমার ভালো করেই জানা আছে, আমার আমলের অবস্থা কি?”

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. যখন আসলেন, (যাকে হযরত উমার রা. অত্যন্ত মহব্বত করতেন) তাকে বললেন, “ইবনে আব্বাস! উমারের কি অবস্থা হবে”? আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনেক এহসান বা অনুগ্রহ করেছেন। আপনাকে অনেক বড় দৌলত দান করেছেন। আপনার হিজরতের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন, আপনার ঈমানের বদৌলতে দ্বীনকে মজবুত করেছেন। আপনি হিজরত করেছেন এবং সকল যুদ্ধে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এমন অবস্থায় যে, তিনি আপনার প্রতি রাজি ছিলেন। তারপরে তার খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর সাথে ছিলেন এবং সকল যুদ্ধে আপনি আবু বকর রা. এর সাথে শরীক ছিলেন। তিনিও এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ্ আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন ইনশা আল্লাহ”।

হযরতে উমার রা. জিজ্ঞেস করলেন যে, "হে ইবনে আব্বাস! তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ কথার স্বাক্ষ্য দিতে পারবে"? তখন ইবনে আব্বাস রা. বলেন যে, "হে আমিরুল মু'মিনীন! হ্যা! আমি কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিবো ইনশা আল্লাহ"। এই সেই উমার যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম ধরে জান্নাতের খোশখবরী দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিনঃ প্রথমেই যাদের বিচার হবে!

একবার সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরাইরাহ্ রা. এক মসজিদে নামায আদায় করেন। সেখানে একজন তাবেয়ী বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনার পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করুন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার হিসাব গ্রহণ করা হবে"? হযরত আবু হুরাইরাহ রা. উত্তর দিলেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন আলিমকে হিসাবের জন্য আনা হবে। তাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি তোমাকে ইলম্ দিয়েছিলাম, সে ইলমের কি হক্ক আদায় করেছিলে"? সে বলবে, "আয় আল্লাহ্! আমি এত পরিমাণ দরস্ ও তাদরীসের কাজ করেছি। আপনার বান্দাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে এসেছি। আমার সারা জীবন শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যয় করেছি, দ্বীনের খেদমত করেছি"। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলবেন – "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এগুলো এ কারণে করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে"!

এরপর ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। হাদিসের এ অংশটুকু হযরত আবু হুরাইরাহ্ রা. শোনানোর পরে বেহুশ হয়ে পড়েন। আবার যখন হুশে ফিরে আসেন তখন পরের অংশ বর্ণনা করেন যে, "তারপর একজন শহীদকে ডাকা হবে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে বলবেন, "তোমার অবস্থা অর্থাৎ তুমি কেন শহীদ হয়েছিলে"? তখন সে উত্তরে বলবে, "হে আল্লাহ্! আপনার দ্বীনকে উঁচু করার জন্য, দ্বীনকে আপনার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমি শহীদ হয়েছিলাম"। আল্লাহ্ বলবেন- "তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি তো এ কারণে শহীদ হয়েছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলে"। অতঃপর তার ব্যাপারেও ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

হাদিসের এ অংশ বর্ণনা করার পরে হযরতে আবু হুরাইরাহ রা. এত পরিমাণ কান্না করেন যে, তিনি আবারো বেহুশ হয়ে যান। পুনরায় জাগ্রত হলে হাদিসের শেষ অংশ বা তৃতীয় অংশ শোনাতে গিয়েও কাদতে কাদতে বেহুশ হয়ে যান এবং বলেন, "এ তিন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আবু হুরাইরার অবস্থা কি হবে"?

রাসূল প্রীতিঃ হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ!

এমন ছিলো সাহাবাদের জিন্দেগী! এই ছিলো সাহাবীয়াদের জীবন! তাদের কুরবানী অনুযায়ী আমাদের কুরবানীর অবস্থা কেমন? তাদের মহব্বতের তুলনায় আমাদের মুহাব্বত কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হযরতে সাহাবাগণ যেমন মহব্বত করতেন সে ক্ষেত্রে আমাদের মুহাব্বত কোন পর্যায়ের? কতটুকু?

জঙ্গে ওহুদের ময়দানে যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হেফাজত করছিলেন, তেমনিভাবে মহিলা সাহাবীগণও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেফাজতের খেদমতে ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, যেখানেই খালি জায়গা চোখে পড়েছে, যেদিক থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে আঘাত আসতে পারে সেখানেই তারা ঢাল বা প্রাচীর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আঘাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। নিজের গায়ে আঘাত লাগার ভয় পাননি। নিজের জীবনের কোন চিন্তা করেননি, তীর ও তলোয়ারের পরওয়া করেননি। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকেই খেয়াল ছিল।

ওহুদের ময়দানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাঁচানোর জন্য যারা ঢাল হয়ে জীবন দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত তালহা রা.। তার শরীরে সত্তরটির অধিক আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দোয়া করে বলছিলেন-

وجبت له الجنة

তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো।

জঙ্গে ওহুদের পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় তাশরীফ আনার পূর্বে - মদিনার মহিলাগণ এ খবর জানতে পারলেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। যখন তিনি মদিনায় ফিরে আসেন তখন সকল মহিলা সাহাবীগণ বাইরে চলে আসেন। সা'দ বিন মুআয রা. নবীজির ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলেন।

সা'দ বিন মায়ায রা. এর ঘরে আসলে তার সম্মানিতা মা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খবর পেয়ে তাকে দেখার জন্য নবীজির সামনে উপস্থিত হন। সা'দ বিন মা'য়ায রা. এর পুত্র এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, "আপনার নাতী শহীদ হয়ে গেছে"। তিনি উত্তর দিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে দেখার পরে আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছে"।

অন্য এক মহিলা সাহাবী ওহুদের ময়দানে দৌড়াচ্ছিলেন। তাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন আছেন? তাকে আবার সংবাদ জানানো হয় যে, তোমার সন্তান শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কি অবস্থা? যখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালো থাকার কথা জানতে পারলেন, তখন বললেন, "সকল মুসিবত হালকা মনে হচ্ছে। সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে"।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখার পর আর কোন কষ্টই থাকতে পারে না। এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবীয়াদের (রা.) অবস্থা। যেখানেই কষ্টের কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দেহ থেকে ঘাম বের হতো, সেখানে তারা শরীরের রক্ত ঢেলে দিতেন। কিন্তু তারপরেও তারা কিভাবে জীবন-যাপন করেছেন? এ দুনিয়াকে কেমন ভয় পেতেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে কিভাবে দুনিয়াতে বসবাস করেছেন? সর্বদা ভয়ে ভীত থাকতেন।

স্বীয় আমলে গর্বিত হওয়াঃ মুনাফিকদের আলামত

নিজের আমলের উপর গর্বিত হওয়া ঈমানদারদের শান নয়। এটাকে কুরআনে কারীমের মধ্যে মুনাফিকদের আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আলামত হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের অন্তরে এখনো ঈমান পৌঁছেনি। কুরআর মাজীদ তাদের ব্যাপারে ঘোষিত হয়েছে- আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। [সুরা হুজুরাত ৪৯:১৭]

অর্থাৎ তারা বলতে থাকে যে, আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি। আমরা ঈমান এনে ইসলামের অনেক উপকার করে ফেলেছি।

আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, আমাদের কি এমন যোগ্যতা ছিলো? আমরাও তো তাদেরই মধ্যে ছিলাম, দুনিয়ার ফিতনায় নিমজ্জিত ছিলাম, সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। দুনিয়া অর্জনের চিন্তা-ফিকির নিয়ে সারাক্ষণ

দৌড়া-দৌড়ি করে বেড়াতাম। আমাদের সামনে দুনিয়া অর্জনের থেকে কোন কাজ ভালো বলে মনে হতো না। আমাদের দিল ও দেমাগ, নজর ও ফিকির এ দুনিয়ার বাইরে কোথাও যেতোনা। আমরাতো ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির জন্য লড়াই করতাম।

আমরাতো সেই লোক যারা এক একটি লোকমার জন্য মারামারি করতাম। সে ভালো পরেছে আমি কেনো সেটা পড়তে পারবো না? তার জন্য ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে আর আমার জন্য কেন হলো না? এসব বিষয়ের ফাঁদে আমরা আটকে গিয়েছিলাম। তারপর আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি মেহেরবানী করেছেন, অনুকম্পা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্থতার দিকে নিয়ে এসেছেন। ঐ সকল ঝগড়া থেকে বের করে শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন। দুনিয়ার মহব্বত থেকে বাঁচিয়ে আখেরাতের মহব্বতে লিপ্ত করেছেন। দুনিয়ার থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত করেছেন। তাহলে আমরা কি করে আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করবো? এটাতো আল্লাহর-ই অনুগ্রহ, তার-ই মেহেরবানী যে, তার পথে আমাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন।

আসুন! কৃতজ্ঞ হইঃ আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকি

আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা!

আল্লাহর এ বিশেষ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা উচিত। এর গুরুত্ব বুঝা দরকার। এ দুনিয়াকে সামনে রেখে প্রথমবার যেমনিভাবে লাথি মেরেছিলাম এবং কখনো এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে এতটাই প্রবল হয়েছিলো যে, সকল মহব্বতের উপর আল্লাহর মহব্বত বিজয়ী হয়েছিলো।

হিজরত করার সময় এমন ধারণা এসেছিলো যে, মা-কে ছেড়ে, বাপকে ছেড়ে, নিজের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে কোন পরিচিতজন নেই। অপরিচিত স্থান, ঘরে ফিরে আসা হবে কি হবে না! আর কখনো ঘরের দৃশ্য দেখা হবে কি-না! কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা সবার উপরে বিজয়ী হওয়ার কারণে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মহব্বত বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জত সকলের উপরে উথলে উঠায়, আল্লাহ্ তা'য়ালা ইহসান ও অনুগ্রহে ময়দানে কদম রাখার পর, রাব্বুল ইজ্জতের স্বাদ আস্বাদনের পরে, আখেরাতের জন্য এ দুনিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার পরে তুমি পুনরায় দুনিয়ার দিকে, দুনিয়া অর্জনের দিকে ফিরে যাবে?

দুনিয়ার মহব্বত যখন একবার অন্তর থেকে বের করে দিয়েছি, দুনিয়ার স্বাদকে যেহেতু একবার মুখের থেকে ফেলে দিয়েছি, তাই দ্বীনের উপরে চব্বিশ ঘন্টা থাকার জন্য, নিজের অঙ্গীকার ঠিক রাখার জন্য সতর্ক থাকা অপরিহার্য। এমন যেন না হয় যে, শয়তান আবার আমাদেরকে দুনিয়ার ফাদে ফেলে দেয়। বড় বড় জিনিসকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এখন ছোট ছোট জিনিসের ফাদে আটকে যেন না পড়ি। দুনিয়াকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আর আখেরাতও যদি হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে এটা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন দুনিয়ার মধ্যে আমাদের থেকে বড় আহম্মক, বেওকুফ কে হবে? আমাদের থেকে নিম্মমানের সৃষ্টি কি হতে পারে? যারা দুনিয়াকেও ধ্বংস করেছে, আবার আখেরাতকেও সুন্দর করে সাজাতে পারেনি?

আমাদেরতো আরো অনেক সতর্ক থাকা দরকার। আমাদেরতো অন্যান্য লোকদের থেকে আরো বেশী ভীত থাকা দরকার। চলার পথে দেখেশুনে কদম ফেলা প্রয়োজন। আমাদের কোন কথার মাধ্যমে, কোন কাজের দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কি-না, আমাদের কোন পদক্ষেপের দ্বারা দ্বীনের কোন ক্ষতি হয়ে যায় কি-না, আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যায় কি-না - এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বল করা চাই।

অনেক বিষয় এমন আছে যা দেখতে ক্ষুদ্র মনে হয়, বাস্তবে তা ছোট নয়, আমাদের নজরে ছোট বলে মনে হয়। আর যদি সেগুলোর গুরুত্ব না দেই তাহলে আমাদের আমলকে নষ্ট করে দেয়। শয়তান এ রাস্তায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে উত পেতে বসে আছে। নফস যে রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, সেদিকেই আমরা দৌড়াচ্ছি এমন

যেন না হয়। আমাদের হিজরত ও জিহাদের পরে এমন মনে করে বসে থাকা যাবে না যে, আল্লাহর এ হুকুম বা বিধান আমাদের জন্য নয়, এটা দুনিয়াদারদের জন্য প্রযোজ্য!

হিজরত ও জিহাদ করা যেমন আল্লাহর হুকুম, তেমনিভাবে বাকি হুকুমগুলোও আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ঐ সকল খারাবী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়ান করেছেন, কুরআনে মাজীদে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেছেন এবং যেগুলো থেকে বাঁচার জন্য আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের দিলের মধ্যে যেন উজব বা স্বীয় আমলের প্রতি আত্মতৃপ্তি না আনেন। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি আর অন্যদেরকে হাক্বীর বা তুচ্ছ মনে করা – এমন হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। এটা ইবলিস এবং শয়তানের বড় একটা মাধ্যম যা দিয়ে মানুষকে ঘায়েল করে বরবাদ করে দেয়। যদি নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করা হয়, নিজেকে দুর্বল এবং অপরাধী মনে করা হয়, তাহলে বড়ত্বের রোগ থেকে বাঁচাকে আল্লাহ সহজ করে দিবেন। নতুবা শয়তান আমাদেরকে বড়াই করার রোগের ব্যাপারে উদাসীন করে দিবে।

আমরা কুরআন পড়বো, দরস্ শুনবো, কিন্তু শয়তান এর দ্বারা অন্যকে সংশোধনের পিছনে ফেলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে। এভাবে এ রোগ বাড়তে বাড়তে মানুষের এ অনুভূতি থাকে না যে, এ খারাবীতো তার নিজের মধ্যেও বিদ্যমান। তার কাছে মনে হতে থাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যে সম্বোধন করেছেন, এর দ্বারা আমাকে নয় বরং অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অমুকের মধ্যে এই দোষ রয়েছে, অমুকের মধ্যে এই খারাবী রয়েছে, কিন্তু নিজেকে সে ভুলে যায়। সফল ব্যক্তিতো সেই, যে ব্যক্তি নিজের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। নিজেকে নিজে গোনাহগার মনে করে, নিজের জন্য সর্বদা আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করে। এবং ঐ সকল জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, যা আলমকে বিনষ্ট করে দেয়।

উপহাসঃ আমল বিনষ্টকারী

যেমনিভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। (সুরা হুজুরাত ৪৯:১১)

এখানে পুরুষের সাথে সাথে নারীকেও সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে 'এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে'। উক্ত আয়াতে কারিমায় মানুষের একটি খারাব অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো উপহাস করা। উপহাসতো সেই করতে পারে যে, নিজেকে বড় এবং ভালো বা উত্তম মনে করে থাকে। অন্যকে ছোট মনে করে থাকে। তাই বলা হয়েছে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হচ্ছে সে ব্যক্তি উপহাসকারী বা উপহাসকারীনির চেয়ে উত্তম। তাই একে অপরের উপহাস করা উচিত নয়। একজন অন্য জনের দোষ-ত্রুটির আলোচনা করা উচিৎ নয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এখানে পুরুষ ও মহিলাদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করেছেন। যাতে করে মহিলাগণও এর থেকে বাঁচতে পারে। বিষয়টি যদিও ছোট মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বড়। যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে ঐ বোন অনেক বড় ইজ্জতের অধিকারীনি হয়, তার মর্তবা অনেক উচু হয় এবং তার অন্তরে কেউ দুঃখ দেয়, তাহলে এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারণ হয়ে দাড়ায়। আর যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে তাহলে বলেন এর থেকে কিভাবে বাঁচবো? তাহলে আমাদের আমল আমাদের কি কাজে আসবে?

তাইতো আমাদেরকে ঐসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা খুব-ই প্রয়োজন, যার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। নফস গাফলতের মধ্যে ফেলে দেয়। এ জন্যই তো সাহাবায়ে কেরামগণ এবং বুযুর্গানে দ্বীন এ গাফলত থেকে পানাহ্ চেয়ে বলতেন, আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে অবসাদ বা গাফলত থেকে হেফাজত করুন। এই দোয়া পড়তেন-

اللهم إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين

হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে গাফেলদের অন্তভূক্ত হওয়া থেকে পানাহ্ চাইছি।

একটি মূহুর্তের জন্য যদি কেউ উদাসীন হয়ে যায়, তাহলেই মানুষ খুব খারাব হয়ে যায়। তার মধ্যে অনেক খারাবী ঢুকে যায়।

এভাবে এ কুরবানী করা, হিজরত করে চলে আসা এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করা সত্যিই অনেক বড় নিয়ামত। কিন্তু আমাদের নফস চেষ্টা করতে থাকে যে, আমাদের মধ্যে নিজের কাজ-কর্মকে নিজের চোখে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে উযব সৃষ্টি করতে। আত্মতৃপ্তি পয়দা করে দেয় যে, তুমিতো হিজরত করেছো, তুমিতো জিহাদ করেছো অথচ অমুকতো - হিজরত বা জিহাদ করেনি; এই অনুভূতিকে নফস এবং শয়তান অন্তরে ঢেলে দেয়। তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে এমন চিন্তা না করা যে, অমুকতো এটা করেনি, সে-তো সেটা করেনি! বরং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে তাওফিক দিয়েছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই এবং যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাওফিক দেননি তার জন্য অন্তরে ব্যথা নিয়ে দু'য়া করতে থাকা যাতে তাকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা তাওফিক দান করেন।

উযব বা আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্যঃ

উযব সৃষ্টি করা বা নিজেকে নিজে ভালো মনে না করা চাই। যদি উযব পয়দা হয়ে যায়, বুঝতে হবে আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থা ঐ দুনিয়াদারের মতো হয়ে যায়, আমাদের বোনদের অবস্থা, মুহাজির বোনদের অবস্থা দুনিয়াদার মা-বোনদের মতো হয়ে যায়। ফলে তারা যেমন কাপড়ের জন্য লড়াই বা ঝগড়া করেতেমনি আমাদের , বোনেরাও কাপড়ের জন্য লড়াই করে। যেভাবে দুনিয়াওলারা সামানা বা আসবাবপত্রের জন্য লড়াই করে, আমাদের বোনেরাও তার জন্য লড়াই করে। যেমনিভাবে তারা ঘরকে সাজানোর জন্য লড়াই করে, তেমনী আমাদের বোনেরাও ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন জিনিসের আবদার করে বসে। যেমন করে দুনিয়াবী লোকেরা আরাম ও আয়েশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেভাবে আমাদের বোনেরাও চেষ্টা করতে থাকে। বস্তুতো একটাই শুধু জাতের ভিন্নতা।

বিষয়টা এমন নয় যে, সে দুনিয়ার জীবনে রয়েছে আর দুনিয়ার ধোঁকায় পতিত হয়েছে। বরং সে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় আর দুনিয়া তার থেকে পালাতে থাকে।

ভোগে নয়; ত্যাগেই প্রশান্তি

তাই এ সকল জিনিসের মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা চাই। এ সকল বস্তু ব্যাবহার করা বা অর্জন করা নিঃসন্দেহে বৈধ। অবশ্যই এ সকল বস্তুকে গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু যদি আপনি এগুলোকে কুরবানী করতে পারেন, অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন তবে সেটা উত্তম। সম্পদ বা কোন বস্তু অন্যকে দিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে স্বাদ অনুভূত হয়, ব্যাবহার বা ভোগ করার মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যায় না।

আপনার সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্র স্বীয় রবের সাথে ব্যক্তির যে সম্পর্ক তা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজেই বুঝতে পারে। এটা অন্যরা বুঝতে পারে না। ত্যাগের মাধ্যমে রবের সাথে সম্পর্কের স্বাদ কতটা বেড়ে যায়, এ সম্পর্কের মধ্যে কতটা গভীরতা বেড়ে যাবে সেটাকেও ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন বস্তুকে নিজের কাছে রেখে দেন বা ব্যবহার করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা বৈধ ছিলো। আর হয়তো মুহাজির বোনের জন্য এ জিনিসের প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু এ বোন নিজের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করে যখন রেখে দিলো, তখন আস্তে আস্তে এটা জমা করার খারাব অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যে বোনের প্রয়োজন সেওতো মুহাজির, একজন মুজাহিদের ঘরওয়ালী। কিন্তু দিলের মধ্যে যখন একবার দুনিয়ার মহব্বত চলে আসে, তারপর সে অন্তর বলতে থাকে যে, এটার প্রয়োজন, সেটার প্রয়োজন আরো কত কী!

এরপর এ নফস বলতে থাকে যে, হয়তো আজকে এ জিনিসের প্রয়োজন নেই কিন্তু কালতো প্রয়োজন হতে পারে। আজকে অন্যকে দিয়ে দিলে কাল তোমার কি অবস্থা হবে? তাই আজকে জমা করে রাখো! আর এভাবেই আখেরাত থেকে দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরতে থাকে।

এজন্য আমার মা ও বোনেরা!

দৃষ্টিকে সর্বদা আখেরাতের দিকে রাখা উচিত। মুজাহিদ কেন দৃষ্টি আখেরাতের দিকে রাখবেন না? আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলের আমলের হেফাজত করুন!

ছোট বয়স থেকে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এমন অনেক বড় বড় লোকদেরকে দেখেছি। তাদের পুরা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে, আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে, পরকাল বরবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে - তখন অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত চলে এসেছে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে।

তাদেরকে আমরা দেখেছি যে দুনিয়াকে সে লাথি মেরেছিলো। আবার তারাই মুর্দা দুনিয়াকে পুনরায় জমা করছে। এতটাই জমা করতে শুরু করেছে যে – যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য জীবনবাজী রেখেছিলোসে দ্বীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করার , চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেছে। দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, দ্বীনকে সওদা বানিয়ে নিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের সাথে গাদ্দারী করে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করেছে। নিজের দুনিয়াকে সাজিয়েছে, নিজের সন্তানদের জন্য মনোরম মহল তৈরী করেছে। আখেরাতকে বিক্রি করে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে। অথচ এ লোকতো সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের জন্য দুনিয়া এবং নিজের সম্পদকে লাথি মেরেছিলো। এ দুনিয়াকে অন্যদের হাতে সোপর্দ করেছিলো আর আখেরাতকে গ্রহন করেছিলো। কিন্তু বেচাকেনার এ চুক্তিকে ধরে রাখতে পারেনি।

নিছক চুক্তি বা ওয়াদা নয়, তার বাস্তবায়নও করা চাইঃ

চুক্তি করা এটা হলো অর্ধেক ক্রয় করা। কেননা আল্লাহর বাণী-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সুরা তাওবা ৯:১১১]

উক্ত আয়াতে কারীমাতে প্রথমে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে -

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। [সুরা তাওবা ৯:১১১]

এটাতো একটা চুক্তি, চুক্তি যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সফলকাম তো সেই ব্যক্তি-

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? [সুরা তাওবা ৯:১১১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই চুক্তিকে পুরা করে। অর্থাৎ এখানে যে চুক্তি করেছিলো যে, হে আল্লাহ্! জান আপনার আর জান্নাত আমার। আমি জান দিয়ে দিবো আর আপনি জান্নাত দিবেন। যখন এই জান্নাতের থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে দুনিয়ার প্রতি নিবন্ধ হয়ে যায় তখন সে ভাবতে থাকে যে, আমার নিকট দামি দামি গাড়ি থাকা চাই, সুন্দর সুন্দর বাড়ি হওয়া চাই, আমার সন্তানের নিকট এটা ওটা থাকা দরকার, আমার এই সেই আসবাবপত্র হওয়া দরকার। তখন সে এ চুক্তিকে আর পূর্ণ করতে পারে না। আর যখন সে এ চুক্তিকে পুরা করতে পারে না, তখন সে কামিয়াবীও হতে পারে না। কামিয়াবী ও সফলতা তার জন্য সে ব্যক্তি চুক্তি করেছে এবং সে চুক্তিকে পূর্ণ করতে পেরেছে।

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সুরা তাওবা ৯:১১১]

অর্থাৎ যে এ চুক্তিকে পুরা করবে সুসংবাদ তার জন্য। খোশখবরী আর মোবারকবাদ ও সফলতা তার জন্য। দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে যে আল্লাহকে বলে, আল্লাহ্ দুনিয়া আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি তাই আপনি আমাকে আখেরাত দিয়ে দিন এবং এর উপর অটল থাকে সেই সফলকাম। আর যে চুক্তি করেছে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছে - অর্ধেক রাস্তায় চলার পর বলে, "আল্লাহ্! আমাকে আমার দুনিয়া ফেরত দিয়ে দিনসে ব্যর্থ – "। এখন বলুন - যখন দুই পক্ষ কোন চুক্তি করে বা ওয়াদা করে এবং মাঝপথে কোন পক্ষ এ চুক্তিকে ভঙ্গ করে তাহলে অপর পক্ষের নিকট কেমন লজ্জাকর মনে হয়? আল্লাহ্ তা'য়ালাতো মহা পবিত্র সত্ত্বা, তিনিতো সবচে বেশি সম্মানিত সত্ত্বা! তার সাথে কেউ একটা চুক্তি করে আর সে মাঝপথে চুক্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়, সে চুক্তিকে পূর্ণ না করাটাতো অনেক বড় বরবাদীর কারণ।

আল্লাহর মহব্বত; কতটুকু আছে?

সুতরাং আমার মা ও বোনেরা!

সর্বদা এ বিষয়ে ভয় করা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অবস্থা ভালো করেই জানে, অন্যকে বলে দিতে হয়না। প্রত্যেক বোনেরা তার নিজের সম্পর্কে খুব ভালো জানে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে তার সম্পর্ক কি পরিমাণ! যখন সে ربی اللہ এবং সেজদার মধ্যে سبحان ربی الاعلی বলতে থাকে তখন আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ কতটুকু অনুভূত হয়?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন - নামায মু'মিনের জন্য মে'রাজ। মে'রাজ কাকে বলে?

মে'রাজতো এমন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মাহবুবে হাক্বিকীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানওলাদেরকে তার সাথে সাক্ষাতের এক মাধ্যম দিয়েছেন। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন তো! অন্তরে যদি কারোর মহব্বত থাকে, উদাহরণ স্বরূপ: সন্তানের ভালোবাসা, ভাই ও বোনের ভালোবাসা, স্বামীর ভালোবাসা। আর যদি কখনো তাদের সাক্ষাতের জন্য যাওয়া হয় অথবা সে সাক্ষাতের জন্য আসে তাহলে তো সাক্ষাতের পূর্বেই তার মহব্বত ও ভালোবাসা সকলেই অন্তরে অনুভব করে থাকে। এটাই হলো মহব্বত ও ভালোবাসা যা সাক্ষাতের পূর্বেই তার স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেয়।

যেহেতু আমাদের দাবী হলো দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসা ও মহব্বতের পাত্র হলো আল্লাহ্ তা'য়ালা। তাই যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাত করতে যাই এবং নামাযে দাড়াই তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয়?

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- বান্দা সেজদার মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। অথচ সেজদার মধ্যে সত্যিকারের প্রিয় সত্ত্বার সাথে যখন আমাদের সাক্ষাত হয় এবং 'سبحان ربى الاعلى' কখনো তিনবার, কখনো পাঁচবার বা সাতবার পড়ছি কিন্তু একবারও স্বাদ অনুভব করতে পারি না। হওয়া দরকার ছিলো এমন, যখন 'سبحان ربى' এই "ربى" (আমার প্রতিপালক) বলার সময় এতটাই মজা বা আনন্দিত হওয়া যাতে করে 'রব্বী' বলাকে দিল শেষ করতে না চায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করা প্রয়োজন যে, 'ربى' কে? 'ربى' তো সেই সত্ত্বা যার সাথে সবচেয়ে বেশি মহব্বত রয়েছে। এমনকি আমার জীবনের চাইতেও বেশি। নিজের সন্তান, পিতা-মাতার থেকেও বেশি মহব্বত রয়েছে। سبحان ربى الاعلى বলার সময় স্বাদ অনুভব করা উচিত। এমন মজা ও স্বাদ অনুভব করা যে, অন্তর বা দিল সেজদাহ থেকে উঠতেই চায় না। আমাদের পূর্বসূরীদের সেজদাহ্ তো এমন-ই ছিলো। 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলার সময় স্বাদ অনুভব করা উচিত।

আমার মা ও বোনেরা!

এই স্বাদ কিভাবে অর্জন করতে পারি? এ স্বাদতো তখনই অর্জিত হবে যখন সর্বদা দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকবো। আর যদি আমরা আমাদের দিলের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে পারি, তাহলে যদি কখনো গাফলত সামনে চলে আসে তো সে গাফলত সম্পর্কে অবগত হতে পারবো।

উদাসীনতা ত্যাগ করা চাই;

আর আল্লাহর ওলী তো সেই ব্যক্তি-ই হতে পারে যে উদাসীনতাকে মরণের চাইতে বেশি ভয় করে। মরণ তাদের জন্য অনেক সহজ কিন্তু উদাসীনতা তার থেকে অনেক যন্ত্রনাদায়ক। যদি সে উদাসীনতা আল্লাহর জিকির থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য অন্তর ছটফট করতে থাকে, কান্না করতে থাকে। এত বেশি কান্না করেন যে, নিজেকে শেষ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলকে গাফলত বা উদাসীনতা থেকে হেফাজত করেন। সর্বদা নিজের দিলের অবস্থা পর্যবেক্ষন করা চাই, কখনো যেন উদাসীন না হয়ে থাকি।

'ইসার' তথা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়াঃ

যেখানেই কোন আসবাবপত্র বা জিনিস সেখানেই 'ইসার' চলে আসে। 'ইসার' বলা হয় এমন প্রয়োজনকে যাহা একদিকে আমার নিজের প্রয়োজন, অন্যদিকে আমার বোনেরও প্রয়োজন। কোন বিষয়ে আমার আরামের বা প্রশান্তির দরকার, কিন্তু আমার বোনেরও সে প্রশান্তির দরকার। এক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসার তাকাজা বা দাবি হলো, 'ইসার' এর দাবী হলো নিজের আরাম বা প্রশান্তিকে, নিজের প্রয়োজনকে কুরবানী করে দেওয়া। কেননা আপনি যে হিজরত করেছেন, সেটা

নিছক নিজের জন্য করেননি। আমাদের এ জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা, সকল মানুষকে হেদায়েতের উপর নিয়ে আসা।

অর্থাৎ মুজাহিদ (আল্লাহর সৈনিক) নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, স্বীয় দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে সকল উম্মাহর ফিকির করছে। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ জন্যই মুজাহিদের অধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আপনার হিজরত শুধুমাত্র আপনার জন্য নয়, বরং পুরা উম্মতের জন্য।

আপনি পুরা উম্মতের জন্য নিজের সবকিছুকে ত্যাগ করেছেন। হিজরত করতে গিয়ে অনেক তিক্ততা আস্বাদন করেছেন! তাহলে আপনার মুহাজির বোনের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে কেন মিলেমিশে থাকবেন না। আপনি মুহাজির বোনের সাথে এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন। ছোট কোন বিষয় নিয়ে তার সাথে লড়াই করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এটা ভালো কাজ নয়। এ জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো যে, আমাদের মাঝে 'ইসার' তথা অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। সাথে থাকা বা বরাবর থাকা এটা এক একিনী মাসয়ালার বিষয়। কিন্তু যেখানে আখেরাতে সবকিছু পাওয়ার বিষয়ে অবগত হয়েছি, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উম্মাহর উপকার পৌঁছানোই উদ্দেশ্য, নিজের কষ্টের বিনিময়ে উম্মতের আরামের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে এ মুহাজির বোনতো আপনারই এক বোন - যে আপনার সাথে হিজরত করেছে। এখনতো হক্ব ও দাবী হলো যে, তার সাথে উত্তম আচরন করা। তার সাথে মুহাব্বতের ব্যবহার করা, বোনের সাথে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করা। এরাই আপনার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক দাবীদার।

আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যে বিষয়টি 'ইসারের' মাঝে রেখেছেন তা হল - আল্লাহ্ তা'য়ালা এর অনের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা মহব্বতের আলোচনায় সবার উপরে স্থান দিয়েছেন 'ইসার' এর ভালোবাসাকে। যার মধ্যে দানশীলতার বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাকে মহব্বত করবেন।

সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে নষ্ট করে দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে মানুষের খবর থাকেনা। মূল বিষয় হলো নফস থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। নফস এর খারাবী থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা। এর থেকে আমাদেরকে উদাসীন না হওয়া চাই। এক মূহুর্তের জন্য অন্তরে এ খেয়াল না করা চাই যে, আমিতো হিজরত করেছি। তাই এখন আর নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে চলতে চলতে ঐ সময় চলে আসবে যে, আমাদের জিন্দেগী দুনিয়াদার মহিলাদের মতো হয়ে যাবে। যেভাবে সে ঘরের সাজ-সজ্জার জন্য সবকিছুকে জমা করে, এগুলোর মহব্বত যেমন তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে – আমাদের অবস্থাও তেমন হয়ে যাবে।

এক তো হলো এমন কিছুকে জমা করা যার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা পরিমাণে বেশিও হতে পারে। হযরতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)দেরকে আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: খায়বারের বিজয়ের পরে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ভাগে অনেক কিছু এসেছিলো, কিন্তু তারা সেগুলোকে কি করেছেন?

দুনিয়ার মহব্বতের নিশানাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে বিশেষতঃ উমার (রা.) এর যুগে মুসলিমদের অনেক প্রশস্ততা আসে। কিন্তু সেগুলোর মহব্বত তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। ধনী সাহাবাদের মতো ধনী সাহাবীয়াও ছিলেন, কিন্তু সে ধনের মহব্বত তাদের দিলের মধ্যে ছিলো না। আসল কথা হলো- এগুলোর মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা উচিত। আর মহব্বত এসে যাওয়ার নিদর্শন হলো- সম্পদকে জমা করতে থাকা এবং আখেরাতের জন্য ব্যয় না করা। নিজের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথচ ভাই বোনের খবর না নেওয়া। সে নিজের আরামের ব্যবস্থা করে, কিন্তু অন্যের আরামের চিন্তা করে না। এগুলোই হলো দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান দেওয়ার আলামত বা নিশানা।

এমন অবস্থা হয় যে, হিজরত এবং জিহাদ করা সত্ত্বেও পুনরায় দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেয়, আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই। স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমরা মুসলিমরা যতটা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছি অন্য কেউ হয়নি। এতটা নির্বোধ কেউ নেই আমরা যতটা নির্বোধ। আমরা না আল্লাহকে পেলাম আর না মূর্তিকে। আমরা না এদিকে না ওদিকে। যদি দুনিয়ার মহব্বতই রাখতে হয়, তাহলে দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো? কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা অনেক বড় করুনা আর মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন।

আমার বোনেরা!

এটা কোন চিন্তার বিষয় নয় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার এক একটা কুরবানীর বিনিময়ে, এক একটা কদমের বিনিময়ে, প্রতিটি দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে, এক একটা পেরেশানীর জন্য জান্নাতের মাঝে এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা দেখে কিয়ামতের দিন তামান্না বা আকাঙ্খা করবেন যে, হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাকে দশটা জীবন দিতে! আমাকে দশটা দুনিয়া দিতে! আর আমি সবকিছুকে আপনার রাস্তায় কুরবানী করে আসতাম!

আমি কোন কাতারের লোক? দেখে নিন

এখন চিন্তা করা বিষয় যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত থাকবেন, হযরতে সাহাবায়ে কেরামগণ থাকবেন, আরো থাকবেন উম্মুল মু'মিনীন ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন, উপস্থিত থাকবেন সকলেই। কাতার বা লাইনে দাড়াবে সকলেই। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ আমল অনুযায়ী লাইনে দাড় করানো হবে। এ দুনিয়াতে যে যার সাথে ছিলো কিয়ামতের দিন তার সাথেই তাকে উঠানো হবে। যদি আমরা এ দুনিয়াকে গ্রহন করে নেই, এ দুনিয়াকে অর্জন করে নেই বা পছন্দ করি, দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই, তাহলে চিন্তা করুন- কিয়ামতের দিন কি ধরনের অপমানিত হতে হবে?

সেখানে ভাই কি কাজে আসবে? আর স্বামী কি উপকারে আসবে? কোন সন্তান উপকারে আসবে? না-কি কোন জাতি তার উপকারে আসবে? সে কেউ কোন উপকারে আসবেনা।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। [সুরা আ'বাসা ৮০:৩৪-৩৭]

কিন্তু আমার বোনেরা!

একটাই তো জিন্দেগী, আল্লাহ্ এ জিন্দেগীকে কবুল করে নেন। এ আমলকে কবুল করে নেন। চিন্তা করুন তো! নিঃসন্দেহে আমরা অনেক পেরেশানীতে রয়েছি। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, হতাশার কোন কারণ নেই। নিজ বাড়িতে হাজারো রকমের নিয়ামত দেখেছি, কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিনি।

কিন্তু আমার বোন!

আপনার এই কুরবানি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং এমন সময় যখন আপনাকে আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো। মানুষেরা আল্লাহর দ্বীনকে একাকী ছেড়ে দিয়েছিলো, পুরুষেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও, ইলম্ থাকা সত্ত্বেও, অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সম্মানিত শরীয়তের জিহাদী ঝান্ডাকে ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক সেই মূহুর্তে তোমরা এ ঝান্ডাকে আকড়ে ধরেছ, তোমরাই পুরুষকে সাহস যুগিয়েছ, তোমরাই নিজেদের সন্তানকে জিহাদের জন্যে উৎসাহ দিয়েছ। তোমরাইতো স্বামীকে

জিহাদেড় ময়দানে পাঠিয়েছ। মহা শক্তিমান আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে স্বাগত জানাবেন। হাউজে কাউসারে তোমাদেরকে স্বয়ং স্বাগত জানাবেন।

তাই আমার বোনেরা!

এ দুনিয়ার পেরেশানী কোন পেরেশানী না। শীতের প্রকোপ অবশ্যই কষ্টের, গরমের প্রখরতাও অবশ্যই বেদনার। কিন্তু জাহান্নামের গরমের কথা একটু স্মরণ করুন। সে জাহান্নামের ঠান্ডার বিষয়টির চিন্তা করুন, কিয়ামতের বিভীষিকার কথা মনে করুন। সেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে দাড়াতে হবে। যার সাথে ভালোবাসার ওয়াদা হয়েছে, যার জন্য আমরা কালিমা পড়ি এবং একটি চুক্তি করেছি,' لا اله الا الله এর অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই' বলে থাকি।

কারোর সাথে কারোর মহব্বত হলে কোন ভূলের কারণে সে তাকে মারবে এ ভয় থাকে না। বরং অপমানিত হওয়ার ভয় থাকে - যে কিভাবে তার সামনে উপস্থিত হবো? তার সাথে মহব্বতের ওয়াদা করেছি অথচ সে ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করিনি। তার ভালোবাসার হক্ব আদায় করতে পারিনি এবং তার সাথে গাদ্দারী করে চলেছি। তাহলে কিয়ামতের দিন কিভাবে সে প্রিয় রবের সামনে দাড়াবো?

জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালাতো পরের কথা। কোন ভদ্রলোক এটা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, তার কোন সম্মানিত আত্মীয় যার সাথে তার অনেক মহব্বত রয়েছে, আর সে তার আত্মীয়র সাথে গাদ্দারী করেছে। এরপর তার সামনে কিভাবে মাথা উচু করবে? কিভাবে তার সামনে দাড়াবে?

তাই আল্লাহর সামনে দাড়ানোর ভয় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এই দাড়ানোর ব্যাপারে ভীত থাকে, সে সফলকাম।

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। [সুরা নাজিয়াত ৭৯:৪০-৪১]

আমার বোনেরা!

এ সকল কুরবানীর বিনিময়ে ইনশা আল্লাহ্ আল্লাহর রহমতের আশা করি। আমাদের আমল নিঃসন্দেহে ছিটা-ফাটা, ভূলে ভরা, আমরা এর হক্বকে ঠিকমত আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে অনুগ্রহ আমাদের উপর করেছেন তার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায়ে কমতি করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে, আমরা দুর্বল, শক্তিহীন। আল্লাহ্ স্বীয় রহমতের দ্বারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং হাশরের ময়দানে তিনি আমাদেরকে তার পছন্দের লোকদের সাথে উঠাবেন ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্ সালেহীনদের সাথে আমাদের উঠাবেন, আল্লাহ্ সাহাবীয়াদের সাথে উঠাবেন, সাহাবীয়াদের সাথে হাশর করাবেন ইনশা আল্লাহ। যার হাশর সাহাবীয়াদের সাথে হবে তার জন্য দুনিয়ার এ ঠান্ডা গরম কি মনে হতে পারে? মাটির কাঁচা ঘরে থাকা কোন দোষনীয় নয়, দুনিয়ার মানুষের ভয় এটাও দোষনীয় কিছু নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে আখেরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারলো তার থেকে বড় সফল কে? যিনি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হবে, হাউযে কাউসারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাকে স্বাগত জানাবেন, তার থেকে বড় কামিয়াব কে হতে পারে?

জেগে উঠুন!

আমার বোনেরা!

নিঃসন্দেহে বড় কুরবানীর সময় এসেছে; আল্লাহ্ আপনাদের কুরবানীকে কবুল করে নিন। আপনাদের পুরুষদের তুলনায় এত বেশি কুরবানী করা দরকার, যাতে করে পুরুষদের এ অভ্যাস হয়ে যায়, তারবিয়্যাত হয়ে যায়, যে মা ও বোনেরা যারা কি-না ঘর থেকে বের হয় না তারা যদি দ্বীনের জন্য, জিহাদের জন্য এতটা উজ্জীবিত হয়, তাহলে আমাদের কেমন হওয়া দরকার! এটাতো আল্লাহ্ তা'য়ার বিশেষ অনুগ্রহ যে, শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাদেরকে দৃঢ় থাকার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে এ রাস্তার মজবুতী দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এজন্য পুরুষদের থেকে অনেক বেশী ফজিলত আপনাদের জন্য রেখেছেন। আপনাদের জন্য আল্লাহ্ অনেক কিছু রেখেছেন। সুতরাং সেগুলোকে সংরক্ষণ করা দরকার।

গোধূলী লগ্নে হৃদয়ের আকুতি!

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে কবুল করে নেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ জীবনকে এমনভাবে কবুল করে নেন, পুনরায় যেন দুনিয়ার ফাঁদে না পড়ে যাই, পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান না পায়। আমাদের কারণে কোন বোনের যেন কষ্ট না হয়। দুনিয়ার ফিতনা আমাদের উপর আবার যেন পতিত না হয়। যদি এভাবে আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতেও সফল এবং কিয়ামতের দিনও সফল ইনশা আল্লাহ্! ছুম্মা ইনশা আল্লাহ্!! আল্লাহর রহমতে উম্মুল মু'মিনীন হযরতে আয়েশা রা. সহ সকল উম্মাতুল মু'মিনীনদের সাথে আপনার হাশর হবে।

একটি স্বপ্ন!

এ ব্যাপারে কয়েকজন বোন স্বপ্নে দেখেছেন যে, তার ঘরে একটি বাচ্চা এসে বললো যে, নিচে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে হযরত আয়েশা রা. বসে আছেন এবং সে বলছেন যে, আমি আপনার নিকট এসেছি জনৈক শহীদের আহলিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে তার বাড়িতে যেতে। তারপরে সে বাচ্চাকে কাধে তুলে দিয়ে বললেন যে, বাচ্চাটিকে আপনার কাছে রাখেন। এমন আরো অনেক স্বপ্ন আছে।

আপনাকে খোদ আমদেদ!

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে খোশখবরী যে, আপনার এ রাস্তা হক্ব বা সত্য। আর এটাতো সাহাবীওয়ালা রাস্তা যে পথে আপনি চলতেছেন। আপনি কোন নফসের খাহেশাত বা চাহিদা পূরণে এ কুরবানী দেননি, বিনা কারণে আপনি কুরবানী করেননি। এক একটা কষ্ট, এক এক কদম, এক একটা পেরেশানী, এক একটা বিচ্ছেদ আপনাকে সর্বদা এমন মিলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে মিলনের মধ্যে কখনো বিচ্ছেদ হবেনা। আর এ দুনিয়ার মিলন কিসের মিলন? দুনিয়ার বিচ্ছেদ কতটুকু? যেখানে মানুষ ধোঁকা দেয়, যেখানে মানুষ ঠকবাজী করে, মানুষ যেখানে একনিষ্ট বা মুখলিস হয়না। কিয়ামত এবং আখেরাতই হলো আসল বা বাস্তব। আখেরাতের মিলনই আসল মিলন, সেদিন যে মিলে যাবে সেটাই হবে আসল মিলন, সেদিন যে সাথী হবে, সেই হবে আসল সাথী। ঐদিন তার সাথে যার হাশর হবে সেই হবে সফলকাম।

তাই আমার বোনেরা!

এ কুরবানী আর ত্যাগ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত অবশ্যই কবুল করে নিবেন। আপনাদের কুরবানীর বিনিময়ে দুনিয়াতে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করবেন। আপনাদের পেরেশানীর বিনিময়ে উম্মতের শান্তির ব্যবস্থা করবেন। উম্মতের নারীদের প্রশান্তি দান করবেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করা দরকার এবং সর্বদা ভীত থাকা প্রয়োজন যে, শয়তান এবং নফস যেন আমাদের আমলকে বিনষ্ট করে না দেয়। আমাদেরকে আখেরাতের রাস্তা থেকে উদাসীন করে না দেয়।

একটি জরুরী মূলনীতি!

ইবাদাতের সাথে সাথে আমাদের লেনদেনও পরিষ্কার হওয়া জরুরী। বোনদের সাথে আমাদের লেনদেন সাফ হওয়া চাই। একে অপরের মঙ্গল কামনা করা চাই। যেহেতু আমরা সকলেই মানুষ, আর মানুষের উপর গাফলতী আসতেই পারে। যদি আমি মনে করি যে, আমার কাছে অনেক ইলম রয়েছে, আমিতো সবকিছুই জানি, আমিতো তাফসীরের কিতাব অধ্যয়ন করি তাই আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। এটা খুবই খারাব ধারণা।

সাহাবায়ে কেরামগণ এমন ছিলেন না। যেহেতু প্রত্যেকেই মানুষ, আর মানুষ উদাসীন হতেই পারে। এক্ষেত্রে জরুরী হলো যদি কোন বোন কোন বিষয়ে গাফেল থাকে বা ভূলে যায়, তাহলে অন্য বোনেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ উসূলটি সর্বদা প্রযোজ্য যে, যিনি দায়ী হবেন অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দেন, সে কখনো রাগ হয় না। সে দিলের মধ্যে এমন ব্যথ্যা নিয়ে দাওয়াত দিবে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৬]

যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে তবে আপকি কি এদের পিছনে নিজেকে হালাক করে দিবেন? ধ্বংস করে দিবেন?

এমন ব্যথা বা দরদ থাকা চাই, এমন জ্বালাপোড়া থাকা চাই। যদি কোন বোনের মধ্যে অবসাদ বা উদাসীনতা দেখা যায়, যদি কোন বোনের মধ্যে কোন বিষয়ে অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে এমন ভাবে সতর্ক না করা যা দাওয়াতে উসূলের খেলাপ এবং তার কাছে কষ্টের মনে হয়। বরং দিলে ব্যথা নিয়ে উত্তম থেকে উত্তম পন্থায় ঐ বোনকে বোঝানো যে, হে বোন এটাতো শরীয়তের খেলাপ আর আমিতো বিষয়টিকে এভাবে শুনেছি। মহব্বতের সাথে দাওয়াত দেওয়া চাই, উত্তম পন্থায় দাওয়াত হওয়া চাই। দ্বীনতো হীত কামনার নাম, দ্বীনতো মঙ্গল কামনার নাম। একে অপরকে যখন এভাবে সতর্ক করতে থাকবো তাহলে যদিও কোন ভূল হয়ে যায় সেটাও দূর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক করা খুব-ই জরুরী।

জান্নাতের কোথায় থাকতে চান!

হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে পা রাখার পরে জান্নাতের কোন নিচের স্তরের উপর রাজি যাওয়া এটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুখারীর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

إنَّ في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ أعدَّهَا اللَّه للمُجَاهِدينَ في سبيلِ اللَّه مَا بيْن الدَّرجَتَينِ كَمَا بيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ

জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা মুজাহিদীনদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের দুরুত্ব আসমান ও জমীনের মতো ব্যবধান।(বুখারী)

তাই যখন তোমরা জান্নাতের দোয়া কর, তখন জান্নাতের উচ্চ স্তরের জন্য দোয়া কর যেখান থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

বোনেরা আমার!

যেহেতু এতটাই করেছি, এত পেরেশানীতে সাতার কেটেছি, এতটা কুরবানী করেছি তাই জান্নাতের নিচু স্তরের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া চাই। স্বামীকে আগে যেতে না দেওয়া, তার সাথে সাথে দৌড়ানো। সূরা মুতাফ্ফিফীনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَ فِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنٰفِسُوۡنَ ﴿ؕ۲۶﴾

এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। [সুরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৬]

প্রতিযোগিতার ময়দানতো এটাই, একে অপরের আগে যাওয়ার ময়দানতো এটাই। সাহাবীয়া রা. কখনো তাদের স্বামীদের থেকে পিছনে থাকার চিন্তা করতেন না। এ জন্য ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা যায় যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এক সাহাবীয়া হাজির হয়ে বললেন যে, "হে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! পুরুষেরা তো জিহাদে গিয়ে আখেরাতের দিকে আগে চলে যাচ্ছে আর আমরা পিছনে থেকে যাচ্ছি"। এই ছিল তার চিন্তা।

আসলে আমাদেরও এমন ফিকির থাকা চাই। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জান্নাতের দরজার দিকে দৌড়ের প্রতিযোগীতা করুন।

আল্লাহ আপনাদের উচ্চ দরজার দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দান করেন। নিচু দরজার উপর যেন আমাদেরকে রাজি না বানান।

আল্লাহ আপনাদের উপরের দিকে দৌড়ানেওয়ালা বানিয়ে দিন। ফেরদাউসে আ'লা-র স্থানে আমাদেরকে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের এ কুরবানীকে কবুল করে নিন। রিয়াকারী হওয়া থেকে আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন। আত্ম-অহমিকা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের এবং আমাদের ঘরের লোকদের আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

****